একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ বাংলাদেশের ছোটগল্প (নির্বাচিত)

শাহনাজ বেগম, গবেষক, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

মেইল আইডি- shahnajbegam510@gmail.com

সারাংশ:

"স্বাধীনতা, সে আমার- স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন-

স্বাধীনতা- আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।

ধর্ষিতা বোনের শাড়ী ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।"

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাতাসে লাশের গন্ধ' কবিতার এই উচ্চারণ সমগ্র বাংলাদেশের মর্মন্তুদ আত্মকথন। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসব্যাপী এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি নিজের আত্মপরিচয় চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের এই পরিধি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে বুদ্ধিজীবী-গবেষক, ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক-জনতা, সকলেই করেছিল নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। অন্যদিকে পাকিস্তানি হায়নারা নারী শরীরের উপর চালিয়েছিল পাশবিক অত্যাচার তাদের লালসাকে পূর্ণ করার জন্য। এই যুদ্ধে যেমন পুরুষ হারিয়েছে তার অঙ্গ তেমনি নারীর ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে জরায়ু। মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের অগ্নিগর্ভ ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হয়েছে বাংলাদেশের নানান ছোটোগল্প- যার প্রতিটি পাতা'ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক একটি দলিল। সেরকমই আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প', হুমায়ূন আহমেদের 'মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র', সেলিনা হোসেনের 'গল্পসমগ্র', 'মুক্তিযুদ্ধের বাছাই গল্প'-এর মধ্য থেকে নির্বাচিত গল্পের মাধ্যমে আমার আলোচনার বিষয়টি উপস্থাপন করব।

সূচক শব্দ: মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, পাকিস্তানি হানাদার, পাশবিক অত্যাচার, প্রতিবাদ

মূল প্রবন্ধ:

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা আসে দেশভাগের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। গঠিত হয় দুটি পৃথক রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। যার ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্তানে পরিণত হয়। এরপর পাকিস্তানের পূর্ব অংশ পশ্চিম অংশ কর্তৃক অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রে ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় রমনার মাঠে সদম্ভে ঘোষণা করেন – "Urdu and Urdu alone would be the language of the state of Pakistan."[১] যার প্রতিবাদে বাঙালি ক্রোধে ফেটে পড়ে - বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা কে মর্যাদা দানের জন্য শহীদ হন রফিক, আব্দুল, জব্বার, বরকত সহ আরো অনেক বাঙালি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। তারপরেও পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ অত্যাচার নির্যাতনের শেষ হয় না - যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত করে, '৭০ এর সাধারন নির্বাচনকে ঘিরে টালবাহানা শুরু হলে সাধারন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ১৯৭১ এ ৭ মার্চ রেসকোর্সের মাঠে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ – "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[২] যা স্বাধীনতাকামী জনতাকে উন্মত্ত করে তুলে। পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে নেমে পড়েন। পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করে-"আমি শুধু বাংলার মাটি চাই, মানুষ নয়।"[৩] যার প্রেক্ষিতেই ২৫মার্চ রাত ১১টায় পাকিস্তানি হানাদাররা অপারেশন সার্চলাইট নামে গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করে। তারা সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করে হত্যা করে, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী নিধন করে, নির্বিচারে সাধারন মানুষ হত্যা করে। সেই হত্যা নিপীড়নে যেমন বাঙালি হিন্দু জর্জরিত হয়েছিল, তেমনি রক্ষা পায়নি বাঙালি মুসলিমও। সৈন্যরা নারকীয় হত্যাযজ্ঞ করেই ক্ষান্ত হয়নি তাদের পৈশাচিকতা মাত্রা ছাড়ায় নারী ধর্ষণের মধ্য দিয়ে। আদিম লালসার জন্য বলি হয় কয়েক লক্ষ নারী, দিনের পর দিন বাংকারে রেখে পাশবিক অত্যাচার চালাতে থাকে সৈন্যরা। সেখানে ধর্ম দিয়ে পৃথক করা হয়নি কোন নারীকেই, তাদের কাছে নারী শরীর কেবল ভোগ্যপণ্য। নারীর উপর এরকম অত্যাচারও যুদ্ধের এক প্রক্রিয়া। নারীর উপর এরকম পাশবিক অত্যাচার করার অর্থ ওই নারীর পরিবারকে মানসিক ভাবে অত্যাচার করা, মানসিকভাবে ভেঙ্গে ফেলা।

এই যুদ্ধে যেমন পাকিস্তানিদের ভূমিকা ছিল তেমনই আরেক স্বার্থসন্ধানী শ্রেণির ভূমিকাও কম ছিল না। এই বাংলারই লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ যারা রাজাকার-আলবদর-আলশামছ দলে ভিড়ে ছিল পাকিস্তান রক্ষার জন্য। এদের সকলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল ছাত্র কৃষক-মজুর-জনতা, গ্রামে গ্রামে মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। অস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও মনের জোরের অভাব ঘটেনি তাঁদের। আর সেখানে নারীদের ভূমিকা অসামান্য। বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে নারীও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। "মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নারীরা সংগ্রাম করেছেন দেশের ভেতরে, শরণার্থী শিবিরে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও বন্দিশালায়। তারা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সেবা দিয়েছেন, নির্যাতিত লাঞ্ছিত হয়েছেন।"[৪] দীর্ঘ ন'য় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালিদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। মুক্ত হয় পূর্ব পাকিস্তান, গড়ে ওঠে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ ইতিহাসকে উপজীব্য করে বাংলাদেশের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। কবিতা ছোটগল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাসকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে। মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের এই ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হয়েছে বাংলাদেশের নানান ছোটগল্প। গল্পের প্রতিটি পাতায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক একটি দলিল। আজহার ইসলামের মতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের দুটি ধারা- প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের পাকিস্তানের সৈন্য ও পাকিস্তানপন্থীদের নারকীয় অত্যাচার কাহিনি নিয়ে গল্প এবং দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক জীবনে যে শূন্যতা সে হঠাৎ ক্ষমতা পাওয়ায় কিছু ব্যক্তির প্রভুত্ব বিস্তারে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হয়, এই অবস্থায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা ও মানসিক বিপর্যয়, ন'মাসের প্রবাস জীবন শেষ করে স্বদেশে ফিরে আসা লোকেদের দুর্দশা এসব বিষয় নিয়ে গল্প রচিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা হয়েছে অগণিত গল্প, কয়েকটি গল্প সংকলন, বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম গল্প সংকলন আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলাদেশ কথা কয়'(১৯৭১), পরবর্তীকালে সংকলিত হয় আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প'(১৯৮৩) ও হারুন হাবীব সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধ: নির্বাচিত গল্প'(১৯৮৫) বিগত কয়েক দশকে কয়েকজন গল্পকারের কয়েকটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে -বশীর আল হেলালের 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার', হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন'। এছাড়াও সংকলিত হয়েছে হুমায়ূন

আহমেদের 'মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র', সেলিনা হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধের বাছাই গল্প' প্রভৃতি। আমার আলোচনার বিষয়টি উপস্থাপন করার জন্য ছোটগল্প গুলি আবুল হাসনাত সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প', হুমায়ূন আহমেদের 'মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র', সেলিনা হোসেনের 'গল্প সমগ্র', 'মুক্তিযুদ্ধের বাছাই গল্প' -থেকে নির্বাচন করেছি।

যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরির আদলে জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পে মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরিটি একজন সাংবাদিকের পাঠের মাধ্যমে আমাদের কাছে যুদ্ধ চলাকালীন পাক-হানাদারদের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ব্যাপী সশস্ত্র অভিযান এর ভয়াবহতা পরিস্ফুট হয়। পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের বুকে জমতে থাকা যন্ত্রণা ঘৃণা ও ক্রোধের রূপ পায়- পাকিস্তানি সৈন্যের মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার মধ্য দিয়ে –"দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে একটি মৃতদেহ কে শত টুকরো করতে করতে জনৈক বৃদ্ধ চিৎকার করে কাঁদছিল। আমার পুলাডারে মারছস। বউডারে নিয়ে গেছস। মাইয়াডারে পাগল করছস। আমার সোনার সংসার পুরা দিছস। আল্লার গজব পড়বো। আল্লার গজব পড়বো।"[৫] ডায়েরিতে যুদ্ধকালীন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের যুদ্ধবিধ্বস্ত ছবি পেলেও সেটা সমগ্র বাংলার প্রতিচ্ছবি। তরুণ মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ সংক্রান্ত এই আত্ম-উপলব্ধিতে পৌঁছায় - মুক্তিযুদ্ধের লড়াই দেশের জন্য প্রতিশোধ নিতেই লড়াই নয়, এই লড়াই সময়ের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীরা বাঙালি নারীর শরীরে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল সেই নির্মম নির্যাতনের ছবি সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন তাঁর 'আমিনা ও মদিনার গল্প'-এ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি বাঙালি মুসলিমদের মনে এই মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কিভাবে ভুল ধারণা তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানকে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়, তাই পাকিস্তানি আর্মি মরণপণ লড়াই করছে। এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন তিনি। গল্পে দেখি জোহরের নামাজের সময় মোয়াজ্জেন আলামিনের দুই ষোড়শী কন্যা আমিনা ও মদিনার প্রতি তিনজন পাকবাহিনীর কুনজর পড়ে। মোয়াজ্জিন কাতর অনুরোধে সৈন্যদের জানান – "মেরে দোনো লাড়কি নামায পড়তা, রোযা রাখতা, কুরআন তেলাওয়াৎ করতা জানতি হ্যায়।"[৬] -সাচ্চা মুসলমানের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও ওই তিনজন হানাদারদের কাছে দুই বোন- "বহুৎ আচ্ছি মাল"[৭] ছাড়া কিছু নয়। তারা কেবল

নারীদেহের মাংসের প্রতি লালায়িত- "ওদের গদগদ কণ্ঠ থেকে থুতু লালা ফেনাসহ বারবার উচ্চারিত হতে থাকে বহুত খুবসুরৎ, বহুত খুবসুরৎ"।[৮] দুই বোনকে তারা ধরে নিয়ে গেলেও প্রতিবাদ করতে পারেনি কারণ পরপুরুষে কণ্ঠ শুনবে বলে আমিনা মদিনা চিৎকার করতে শেখেনি, শেখেনি উচ্চস্বরে কাঁদতে। তারা জানে বিপদে 'আয়াতুল কুরসি' পড়তে হয়, তিনবার 'দরুদ' পড়ে বুকে ফুঁক দিতে হয়। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় তারা ছেলেবেলা থেকে মুখস্ত করার দোয়া দরুদ পড়তে ভুলে যায়। বিহ্বল পিতা আল-আমিন ইমামের কাছে ছুটে গিয়ে দুই মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য পীড়াপীড়ি করলে ইমাম জানান- "এই দেশে এখন ইসলাম বিপন্ন, এটা রক্ষা করার সবার দায়িত্ব। আপনি তো শুধু মেয়ে দিয়েছেন।"[৯] রাজনীতিতে ধর্মের এমন বিকৃত ব্যবহার উপলব্ধি করে মোয়াজ্জিন অসহায় ভাবে কাদেঁ, শেষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে বাংকারে মাসের-পর-মাস আমিনা মদিনার উপর চলতে থাকে পাশবিক অত্যাচার। তারা বুঝতে পারে পাকিস্তান রক্ষকরাই ভক্ষক।তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে শয়তানগুলোকে শেষ করে একদিন মুক্তিযোদ্ধারা তাদের উদ্ধার করবেই কারণ- "ওরা তো আমাদের দেশের মানুষ"।[১০]

সুসান ব্রাউন মিলার রচিত "Men, Women and Rape" বইয়ে এ রকমের তথ্য দেওয়া হয়েছে: "হিসাব অনুযায়ী ২০০০০০(দুই লাখ) বাঙালি নারী নয় মাসব্যাপী সংঘর্ষে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল।"[১১] এরকমই যুদ্ধকালীন ঢাকা শহরের আতঙ্কিত পরিস্থিতি নিয়ে লেখা আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'কেয়া আমি এবং জার্মান মেজর'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্যারিস দখল করার পর জার্মান সৈন্যরা ফরাসি যুবতীদের ধরে নিয়ে যেমন ফুর্তি করেছে পাকিস্তানি হানাদাররাও তেমনি ভাবে অবরুদ্ধ ঢাকায় চরিতার্থ করেছে তাদের আদিম লালসা – "ওরা কাউকে মারেনি। কাউকে কিছু বলেনি। লরীতে একজন মেজর ছিল সে কেবল সোনিয়াকে নিয়ে গেছে"।[১২] সেই সোনিয়াকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয় সৈন্যদের কামাগ্নিকে শান্ত করতে, প্রতিদিন সকালে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার ক্ষতবিক্ষত শরীর। গল্পে রহমান সাহেব প্যারিস দখল নিয়ে একটা গল্প শোনান যেখানে প্যারিসের এক বিদূষী নারী কিভাবে জার্মান মেজরের শয্যাসঙ্গিনী হতে গিয়ে কৌশলে ধারালো ব্লেড দিয়ে তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে হত্যা করেছিল। গল্পের মধ্যে বাঙালি নারীকেও এরকমই বীরঙ্গনা হয়ে ওঠার আভাস দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি বর্বর সেনা নারী ধর্ষণের যে নারকীয় খেলা শুরু হয়েছিল তাতে মোড় ফিরিয়ে দেয় বাঙালি নারীরাও। তাদের আজন্মলালিত সতীত্বের সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার টোপ দিয়ে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরকমই এক বাস্তব গল্পের উপর ভিত্তি করেই সত্যেন সেনের 'পরীবানুর কাহিনী' রূপায়িত হয়েছে। যেখানে পরীবানু সহ আরো কয়েকজন নারী স্বেচ্ছায় তিনজন পাক সৈন্যের পশুপ্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে উপযুক্ত মুহূর্তে রণরঙ্গিনী রূপে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে- "এভাবেই তিনজন সশস্ত্র সৈন্য এই মেয়েদের হাতে মারা পড়লো"।[১৩]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্বর দেখা যায় হুমায়ূন আহমেদের 'উনিশ'শ একাত্তর'গল্পে। যেখানে সাধারন মানুষের প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠেছে। গল্পে পাকিস্তানি মেজর দলবল নিয়ে আজিজ মাস্টারকে জনসম্মুখে নগ্ন করে লাঞ্ছিত করে। ভীতু স্কুল মাস্টারের মনোলোকে এই ঘটনা এতটাই আঘাত করে যে ঘৃণা ও দৃঢ়তার সাথে হঠাৎ মেজরের উপর থুথু ফেলে প্রতিবাদ করে মেজরকে পিছু হটতে বাধ্য করে – "মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ"।[১৪]

এই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাহায্য করেছিল এই বাংলারই কিছু স্বার্থসন্ধানী মানুষ, যারা পাকিস্তান রক্ষার জন্য রাজাকার হয়ে উঠেছিল। যাদের অন্যতম কাজই ছিল গ্রামের যুবতী মেয়েদের পাক বাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়া। সেইসব রাজাকারদের হত্যার প্রসঙ্গ সেলিনা হোসেনের 'সখিনা ও চন্দ্রকলা' গল্পে আমরা দেখি। যেখানে রব বাহিনীর ইনফর্মার সখিনাকে দুবার দুজন রাজাকার পাট ক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল –"এটাও যুদ্ধ, শরীর দিয়ে যুদ্ধ।"[১৫] কিন্তু ধর্ষণ তাকে দমাতে পারেনি "বরং ওই ধর্ষণ তাকে আরও তেজী করেছে।"[১৬] সখিনা তার দা দিয়েই পাঁচজন রাজাকারকে হত্যা করে। পাকিস্তান থেকে বাংলা মুক্তি পেলেও সখীনা জানত সোলেমানের মত রাজাকাররা বেঁচে থাকতে এই বাংলার মানুষের মুক্তি নেই, তাই সে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে চায়নি।

যুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি মানুষ ঘর ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হতেই তারা ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে পায় না তাদের পূর্বের গ্রামের সেই শান্তির নীড় সবই এখন বিধ্বস্ত। নিঃস্ব হাতে গৃহহীনদের নতুন ঘরের খোঁজ নিয়েই হাসান আজিজুল হকের 'ঘরগেরস্তি' গল্পটি রচিত। যেখানে রামশরণ ও তার পরিবার যুদ্ধ শুরু হতেই পূর্ব পাকিস্তান

ছাড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে তাদের ভিটেমাটির চিহ্নও খুঁজে পায় না, চারিদিকে শেয়াল-কুকুরের আস্তানা গড়ে ওঠে। জিনিসপত্র বাকে তুলে রামসরনের পরিবারের আবার চলা শুরু হয় অনির্দিষ্ট পথে –"কিন্তু লঞ্চে যাবেনা রামশরণ। লঞ্চ ধরে কোথাও যাওয়ার নেই তার। তবে কোথাও সে নিশ্চয়ই যাবে।"[১৭]

মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও নিজের সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করেছিল। যুদ্ধ শেষে যে স্বাধীনতা এল, সেখানে পুরুষ শরীরে আঘাত নিয়েও 'মুক্তিযোদ্ধা' রূপে সম্মান পেল। আর নারী তার জরায়ুর ক্ষত নিয়ে সমাজের কাছে শুধু 'যুদ্ধাহত' বলে অভিহিত হল-

"তুই না মিলিটারির লগে শুইছিলি?

নিজে শুই নাই। আমারে শোয়াইছিল।

ওই তো কথা একডাই। বেশি কথা কঅনের কাম নাই।"[১৮]

সেলিনা হোসেনের 'মা-মেয়ের যুদ্ধ' গল্পের এই কথোপকথনের থেকে বোঝা যায় পাকসৈন্য দ্বারা ধর্ষিতা নারীর প্রতি সমাজের নীচ দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে দিনের আলোয় জরিবানুর পরিবারকে 'শহীদ পরিবার' বলে সম্মানিত করে, রাতের অন্ধকারে দরজা ধাক্কা ও নানা কুমন্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের অপমানিত করে। "বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে ধর্ষিত, নির্যাতিত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' বলে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছে। কিন্তু সমাজের দীর্ঘ লালিত সংস্কার ও মুল্যবোধ এই সম্মানগত সমর্থনের পরও বদল হয়নি।"[১৯]

দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজাকাররা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করতে চায় এই মা ও মেয়ে। এই গল্পে "সুফিয়া বলে, বাজান তো যুদ্ধ করছিল। শহীদ হইছে। আমার মনে হয় আবার যুদ্ধ হইবো। রাজাকাররা মাথা তুলতাছে। তোমার হাত-পা তো ঠিক আছে মা, তুমি পারবা না যুদ্ধ করতে? জরিবানু উঠে দাঁড়িয়ে হাত-উঁচিয়ে বলে, পারুম।"[২০] এটাই স্বাধীন দেশের শহীদ পরিবারের স্বপ্ন।

বাংলাদেশের ছোটগল্প মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে এভাবেই বহন করে চলেছে। পাকিস্তানের তেইশ বছরের শোষণ বঞ্চনা থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগী

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই বঞ্চিত রয়ে গেছে, অনেকেই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির আড়ালে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক এই ছোটগল্প গুলি তাদের অবদানকে স্মরণ করেই বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান এই গল্পগুলিতে রক্তাক্ষরে লেখা।

তথ্যসূত্র :

১. https://www.dhakatribune.com/opinion/op-ed/2020/03/04/when-mr-jinnah-came-to-dhaka

২. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, ইউটিউব,

৩. https://www.dailyjanakantha.com/details/article/411963/

৪. মালেকা বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রচ্ছদপটের অংশ

৫. আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৫৪

৬. সেলিনা হোসেন, মুক্তিযুদ্ধের বাছাই গল্প, প্রথম প্রকাশ ২০১৭ বইমেলা, অন্য প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৬০

৭. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬০

৮. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬০

৯. ঐ, পৃষ্ঠা- ৭০

১০. ঐ, পৃষ্ঠা- ৭৪

১১. মালেকা বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬৫

১২. আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা,পৃষ্ঠা- ৬৩

১৩. আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৩১

১৪. হুমায়ূন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র, প্রথম প্রকাশ ২০১৮ বইমেলা, পৃষ্ঠা- ৯০৪

১৫. সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৬০০

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা- ৬০০

১৭. আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১২১

১৮. সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৬৬৯

১৯. মালেকা বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী, প্রথম প্রকাশ ২০১১, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ১৭৪

২০. সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০, সময় প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ৬৭২

আকর গ্রন্থ:

- আবুল হাসনাত (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের গল্প, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা
- সেলিনা হোসেন, মুক্তিযুদ্ধের বাছাই গল্প, প্রথম প্রকাশ ২০১৭ বইমেলা, অন্য প্রকাশন, ঢাকা
- সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১০, সময় প্রকাশন
- হুমায়ূন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র, প্রথম প্রকাশ ২০১৮ বইমেলা

সহায়ক গ্রন্থ:

- গোলাম মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর:একটি নির্দলীয় ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ২০১০, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা
- মননকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), পার্টিশন সাহিত্য দেশ-কাল-স্মৃতি, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, গাঙচিল